মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম [রহ.]

প্রচলিত রাজনীতি নয় জিহাদই কাম্য

প্রচলিত রাজনীতি নয়

জিহাদই কাম্য

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.)

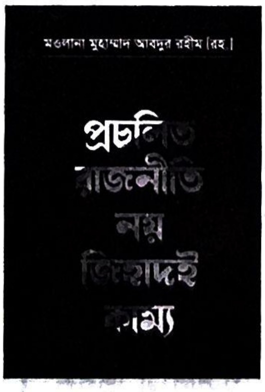

প্রকাশনায়

ইসলামী ঐক্য আন্দোলন

সম্পাদকের কথা

বাংলাদেশ একটি সমস্যা ভারাক্রান্ত দেশ। এদেশের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও শিক্ষানীতি অজস্র সমস্যার কশাঘাতে জর্জরিত। এ সব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান কোন পথে– প্রচলিত রাজনীতিতে, না অন্য কোনো উপায়ে এ প্রশ্নগুলো অনেক দিন ধরেই দেশের চিন্তাশীল লোকদের মনকে প্রবলভাবে নাড়া দিচ্ছে। ধর্মহীন বা সেক্যুলার রাজনীতির প্রবক্তারা প্রচলিত রাজনীতিকেই দেশের সব রোগ-ব্যাধির একমাত্র দাওয়ারূপে গণ্য করতে চাইছেন। তারা গণতন্ত্রের নামাবলী পরে দিন-রাত গলাবাজি করছেন, মাঠ-ঘাট গরম করে তুলছেন; কিন্তু প্রচলিত রাজনীতি এদেশের পুঞ্জীভূত সমস্যাবলির কতটা সমাধান করতে পেরেছে? গণতন্ত্রের গলাবাজিই বা এদেশের নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ে কতটা সক্ষম হয়েছে এ প্রশ্নটি কেউ খতিয়ে দেখার প্রয়োজনবোধ করছেন না। তাই একটি জননির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় বসার পরও রাজনৈতিক বিতর্কের অবসান ঘটছে না এদেশে।

এ ভূখণ্ডে ইসলামী আন্দোলনের মহান স্থপতি এবং ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা-চেয়ারম্যান হযরত মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর

রহীম (রহ) প্রচলিত রাজনীতির ব্যর্থতা সম্পর্কে এক চমৎকার আলোচনা উপস্থাপন করেছেন বর্তমান পুস্তিকায়। তিনি অকাট্য যুক্তি-তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণ করেছেন যে, প্রচলিত রাজনীতিতে এ দেশের কোনো সমস্যার এতটুক সমাধান হতে পারে না। এর মাধ্যমে দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজও অগ্রসর করা সম্ভবপর নয়। মূলত এ রাজনীতি হচ্ছে পাশ্চাত্যের কুফরী ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-বিশ্বাসের অনিবার্য ফসল। এর সাহায্যে মুসলিম জাতির কোনো রোগ-ব্যাধির নিরাময় হতে পারে না; সেটা হতে পারে কেবল আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশিত জিহাদী তরিকায়, ইসলামী জনতার ঐক্যবদ্ধ সর্বাত্মক প্রচেষ্টায়। কাজেই প্রচলিত রাজনীতির মোহ ত্যাগ করে এ তরিকায় এ প্রচেষ্টায়ই শামিল হওয়া উচিত বাংলাদেশের গোটা ইসলামী জনতার। এটাই তাদের মুক্তি ও আজাদীর রাজপথ।

পুস্তিকাটি ১৯৮৫ সালে এরশাদের সামরিক শাসনের প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও এর মূল প্রতিপাদ্য এখনও পুরোপুরি অক্ষুন্ন রয়েছে। পুস্তিকাটি বাংলাদেশের সত্য সন্ধানী জনতার কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত হওয়ায় অল্প দিনের মধ্যেই এর একাদশ সংস্করণ বের করতে হয়েছে। এজন্য আমরা মহান আল্লাহর দরবারে লাখ লাখ শুকরিয়া আদায় করছি।

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
সাবেক চেয়ারম্যান
মওলানা আবদুর রহীম (রহ.) রিচার্স ফাউন্ডেশন

প্রারম্ভ কথা

'প্রচলিত রাজনীতি নয় জিহাদই কাম্য' এ পর্যায়ে আমার এ আলোচনা নেহাত কোনো তাত্ত্বিক বক্তব্য নয়। দেশের সমসাময়িক অবস্থার সাথে সাধারণভাবে এবং ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত লোকদের মানসিক জিজ্ঞাসার সাথে বিশেষভাবে এর সম্পর্ক রয়েছে। দেশের বর্তমান (১৯৮৫) অবস্থার সাথে আমাদের তৎপরতা সামঞ্জস্যশীল কি না এবং দেশে প্রচলিত রাজনৈতিক ধারার সাথে আমাদের সম্পর্ক কী, সংশ্লিষ্ট সকলের মনে জেগে উঠা এ একটি জিজ্ঞাসা। এ জিজ্ঞাসার জবাব একান্তই প্রয়োজন।

আমি এ পর্যায়ে একটু বিশদ আলোচনা পেশ করার প্রয়োজন মনে করছি- যেন আমাদের কাফেলায় শামিল লোকেরা তাদের মনের প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব জানতে পারেন। ভবিষ্যতের দিকে চলার পথনির্দেশ লাভ করতে পারেন এবং তাদের সম্মুখে আপন জীবন-লক্ষ্য সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে উঠে। আর সেই সাথে দেশবাসীও রাজনীতির ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাস ও তৎপরতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে সমর্থ হয়।

বর্তমানে দেশে যে রাজনীতি চলছে, সকলেই জানেন, আমরা সে

রাজনীতিতে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। দেশের পরিচিত রাজনৈতিক দল, জোট ও গোষ্ঠীগুলো যা যা বলছে ও করছে আমরা তা বলছি না, করছিও না। আমাদের কথা ও কাজ দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ধারাপ্রবাহের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। এদেশের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে আমাদের বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্নতর। রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ যে সব মৌলিক সমস্যার কথা বলে, আমরা সেগুলোকে আদৌ মৌলিক সমস্যা মনে করি না। তারা সমস্যাবলির যে সমাধান পেশ করে আমরা তাকে আদৌ সমাধান মনে করি না; বরং আমাদের দৃষ্টিতে দেশ ও জাতির প্রকৃত সমস্যার দিকে তাদের আদৌ দৃষ্টি নেই। তা তাদের চোখেও পড়ে না। তাদের পেশকৃত সমাধান বরং আমাদের দৃষ্টিতে নতুন করে সমস্যা সৃষ্টিরই নামান্তর। শুধু তাই নয়, সমাধানের নামে তারা যে জিনিস জাতির সম্মুখে উপস্থাপন করছে, তা পুরাতন সমস্যারই পুনরাবৃত্তি। সে সমাধান জাতির প্রকৃত মুক্তির পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে; বরং আজ প্রকৃত সমস্যার সমাধান যত সহজ, তাদের উপস্থাপিত সমাধান তাকে তত বেশি কঠিন ও দুঃসাধ্য বানিয়ে দিতে পারে। তাই এ ব্যাপারে আমরা তাদের সাথে কিছুমাত্রও একমত নই।

দেশের বর্তমান সার্বিক অবস্থা

দেশের বর্তমান[১] সার্বিক অবস্থা হচ্ছে, প্রায় চারটি বছর ধরে দেশে সর্বাত্মক সামরিক শাসন চলছে। সামরিক শাসন জনপ্রতিনিধি নয়- জনগণের একবিন্দু আস্থাভাজনও নয়- এমন এক ব্যক্তির নিরংকুশ ও স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন। এখানে সর্বময় কর্তৃত্ব এক ব্যক্তির কুক্ষিগত। সে একাই স্বাধীন। দেশের জনগণের না কিছু ভাববার বা বলবার অধিকার আছে, না আছে সেই এক ব্যক্তির মতের বিরুদ্ধে কিছু করার একবিন্দু অধিকার। সকল নাগরিক সেই এক ব্যক্তির নিরংকুশ কর্তৃত্বের অধীন, অধিকার বঞ্চিত নিকৃষ্ট গোলাম। কে 'ভালো' কে 'মন্দ' বললে তা-ই মন্দ হয়ে যায় আর মন্দকে ভালো বললে তাই সকলকে ভালো জেনে গ্রহণ করতে হয়। সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি ও চিরন্তন শাশ্বত আদর্শের ভিত্তিতে কোনটা প্রকৃত ভালো আর কোনটা প্রকৃত মন্দ তা বলার বা প্রচার করার অধিকার

কারো নেই।[২] মানবতার জন্য এর চাইতে অধিক লাঞ্ছনা ও অবমাননা আর কী হতে পারে।

বর্তমানে (১৯৮৫) দেশের জনজীবন সর্বদিক দিয়েই অসম্ভব, দুঃসহ ও কঠিনতম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে জীবন ও মান-ইজ্জতের কোনো নিশ্চয়তা নেই। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য একেবারে লাগামহীন, নিয়ন্ত্রণহীন, জনগণের ক্রয়ক্ষমতার অনেক অনেক ঊর্ধ্বে। প্রশাসন ও বিচার বিকেন্দ্রীকরণের[৩] নামে বিচারকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করা হয়েছে; যে যত বেশি মূল্য দিতে পারে, বিচারকে সে তত নিজের পক্ষে ক্রয় করতে পারে। ঘুষ-রিশওয়াতের রাজত্বকে উপজেলা পর্যায়ের প্রশাসন থেকে শুরু করে গ্রাম-পল্লী এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত করে দেয়া হয়েছে। গ্রামের টাউট, চোর-ডাকাতের দাপটে নিরীহ জনগণ ভয়ে থর থর করে কাঁপছে। জীবনের স্বস্তি সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে গেছে। প্রশাসন কার্যত 'দুষ্টের পালন ও শিষ্টের দমন'-এর কাজ করে যাচ্ছে।

এখানে সাধারণ মানুষ তথা মানব-বংশের কোনো মূল্য বা মর্যাদা নেই। মানব বংশের অপ্রতিরোধ্য বৃদ্ধিতে সর্বময় কর্তৃত্বশালী ব্যক্তি নিজেকে রিযিকদাতা মনে করে সাংঘাতিকভাবে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট। কুকুর বা গরু-ছাগলের বংশ বৃদ্ধিতে তার কোনো আপত্তি নেই। তাই বিশ্ব ইয়াহুদী সংস্থাসমূহের ঋণ বা 'সাহায্য' বাবদ দেয়া কোটি কোটি টাকা অকাতরে ও বিনা হিসাবে উড়ানো হচ্ছে মানব-বংশের অব্যাহত বৃদ্ধির প্রবাহকে রুদ্ধ করার জন্য, যা মূলত কুরআন-সুন্নাহ ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই ছাড়া আর কিছুই নয় এবং যার ব্যর্থতা একান্তভাবে অনিবার্য অবধারিত।

দেশে প্রকৃত জনমতের এক কানাকড়িও মূল্য নেই। প্রকৃত জনমত প্রকাশের সকল পথই কার্যত বন্ধ।[৪] গণভোট বা উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচনের প্রহসন দেখিয়ে জনমতের মূল্য ও নাগরিকদের মর্যাদার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো হয়েছে। তথাকথিত এ নির্বাচনে প্রকৃত ভোটদাতারা ভোট কেন্দ্রে না গেলেও তাদের ভোট অদেয় থাকেনি এবং এভাবে না-দেয়া ভোটকে দেয়া গণ্য করে শতকরা নব্বই ভাগেরও বেশি ভোট পেয়ে আস্থালাভ বা নির্বাচিত হবার সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন গৌরব প্রচার করে বেড়ানো হচ্ছে।[৫] বিশ্ব সাংবাদিক মহল এ ভোটাভুটির ভিত্তিহীনতা ও

কৃত্রিমতা প্রত্যক্ষ করলেও উক্ত গৌরব প্রকাশে একবিন্দু লজ্জাও বোধ করা হয় না। এই কৃত্রিমতা ও তার ওপর এহেন নির্লজ্জতা এ জাতির জন্য এক দূরপনেয় কলংক, সন্দেহ নেই।

জাতীয় সম্পদের বিরাট অংশ কর্তাব্যক্তি ও তার চাটুকাররাই নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিচ্ছে। এখানে জাতীয় সম্পদ যে যত বেশি মেরে দিতে পারে, সে তত বেশি যোগ্য বলে বিবেচিত হয় এবং তার পদোন্নতি তত বেশি নিশ্চিত হয়। যারা তা পারে না বা নীতিগতভাবেই করতে চায় না, তারা উপেক্ষিত- পদোন্নতির ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকেও বঞ্চিত।

এ জাতির কোনো সুনির্দিষ্ট আদর্শ নেই। নেই এর কোনো দিক-নির্দেশনা। এ জাতির কার্যক্রম অপরিকল্পিত লক্ষ্যহীন, নিরুদ্দিষ্ট। আর শাশ্বত কথা হচ্ছে, সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও দিক-নির্দেশনা ছাড়া কোনো জাতির অস্তিত্ব অসম্ভব; সে জাতির কোনোরূপ উন্নয়নও কল্পনাতীত।

প্রতিবেশী দেশের পণ্যে বাজার ছেয়ে গেছে বলে এদেশের পণ্যের কোনো চাহিদা নেই- বিক্রয় নেই। তাই কল-কারখানাসমূহ অচল।

এ জাতি এখনও বাস্তবভাবে স্বাধীন নয়। কারণ এদেশে আইন-কানুন, শাসন পদ্ধতি ও জাতীয় জীবনের রীতি-নীতি ও প্রথা-পদ্ধতি এখনও ঠিক তাই কার্যকর যা এই গোলাম দেশকে গোলাম বানিয়ে রাখার জন্য ইংরেজরা চালু করেছিল। এর জীবন-দর্শন, জীবন-লক্ষ্য, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, শিল্প-সংস্কৃতি, রাজনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা, অর্থনীতি ও প্রশাসন-পদ্ধতি এখনও পুরাপুরিভাবে এবং কোনোরূপ পার্থক্য ব্যতিরেকে ঠিক তা-ই, যা এই গোলাম দেশের জনগণকে গোলাম করে রাখার উপযোগী করে বৃটিশরা চালু করে গেছে। বিগত আটত্রিশ[৬] বছরেও তাতে একবিন্দু পরিবর্তন সূচিত হয়নি। তাই আমি নির্দ্বিধায় বলছি যে, "আমরা দু'-দু' বার স্বাধীন হয়েও একান্তই পরাধীন হয়ে আছি।" আমরা নিজেদেরকে যতই স্বাধীন বলে দাবি করি না কেন, সে দাবির অন্তঃসারশূন্যতা অত্যন্ত প্রকট ও অনস্বীকার্য। স্বাধীন জাতির কোনো বৈশিষ্ট্যই আজ আমাদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

প্রচলিত রাজনীতি

রাজনীতির সাথে রাষ্ট্র সম্পর্কিত রীতিনীতি, নিয়ম-পদ্ধতি, আইন-কানুন ও আদর্শের সম্পর্ক ওতপ্রোত। আর রাষ্ট্র হচ্ছে সর্বাত্মক-সর্বগ্রাসী। তাই রাজনীতির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আমাদের সামগ্রিক জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগের সাথে অত্যন্ত গভীর। তাই এদেশে বর্তমানে যে রাজনীতি চলছে, সে রাজনীতি নিয়ে দেশের রাজনৈতিক দল ও দলসমূহের জোটগুলো কঠিনভাবে ব্যতিব্যস্ত। সে রাজনীতি দেশের সার্বিক অবস্থার সাথে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, তার দ্বারা আমাদের জাতীয় জীবনের প্রকৃত সমস্যার সত্যিই কোনো সমাধান হওয়া সম্ভব কি না এবং আমরাই বা এ রাজনীতির ক্ষেত্রে অনুপস্থিত কেন, তার যৌক্তিকতা কী, বিস্তারিতভাবে এ সবের বিশ্লেষণ হওয়া আবশ্যক। অতঃপর এ পর্যায়ে আমার বক্তব্য পেশ করছি।

প্রচলিত রাজনীতির মূল্যায়ন

প্রচলিত রাজনীতির ব্যাপক মূল্যায়ন পর্যায়ে আমার বক্তব্য হচ্ছে ঃ

১. দেশে বর্তমানে যে রাজনীতি চলছে, প্রথমত তা গোলামীর প্রতীক। এদেশ যে অতীতে পরাধীন ছিল এবং এখনও কিছুমাত্র স্বাধীনতার বিশেষত্ব লাভ করতে পারেনি, তার বাস্তব ও অকাট্য প্রমাণ হচ্ছে দেশের প্রচলিত রাজনীতি। এ রাজনীতি হুবহু তা-ই, যা ইংরেজ এ দেশের 'হর্তাকর্তা-বিধাতা' থাকাকালে চালু করেছিল অধীন দেশের জনগণকে গোলাম বানিয়ে রেখে শাসন ও শোষণ করার জন্য, গোলাম উপযোগী রাজনীতি হিসাবে।

সকলেরই জানা কথা, উপমহাদেশে যখন স্বাধীনতার জন্য বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন ব্যাপক ও তীব্রতর হয়ে উঠেছিল, তখন ইংরেজরা মনে করেছিল এদেশে এমন এক ধরনের রাজনীতি চালু করা এবং রাজনৈতিক তৎপরতা চালানোর সুযোগ করে দেয়া আবশ্যক, যা পেয়ে এদেশের জনগণ পরাধীন থেকেও নিজেদেরকে স্বাধীন মনে করতে পারবে; এমন এক

রাজনৈতিক ঘোরপ্যাঁচে তাদেরকে জড়িয়ে দেয়া দরকার, যার জটাজালে বন্দী থেকেও তারা মনে করবে- আমরা স্বাধীনতা পেয়ে গেছি, আমরা আমাদের নেতা নির্বাচন করে তাদের দ্বারা শাসিত হওয়া এবং তাদের মাধ্যমে বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা ও চাকরি লাভের উপায় খুঁজে পাচ্ছি; সর্বোপরি তা হবে এমন এক রাজনীতি, যার মধ্যে লিপ্ত থেকে জনগণের প্রকৃত আস্থাভাজন, তাদের প্রকৃত কল্যাণকামী, সত্যদর্শী ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা নির্বাচিত হতে, জনগণের নেতৃত্ব দিতে এবং তাদের জাতীয় আদর্শ বাস্তবায়নে কখনই সক্ষম হবে না।

এ উদ্দেশ্যেই ইংরেজ সরকার ১৯৩৫ সনে ভারত শাসন আইন জারি করে। এই আইনের ভিত্তিতে কেবল প্রাদেশিক পরিষদের নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য নির্বাচনে বিশেষ পরিমাণের করদাতাদের ভোট দানের সুযোগ দেয়া হয়। যদিও দেশের সার্বভৌমত্ব তখন বৃটিশ সরকারেরই কুক্ষিগত এবং সমগ্র উপমহাদেশের উপর বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে বড়লাটেরই একচ্ছত্র কর্তৃত্ব কার্যকর ছিল। সর্বোপরি তখন উপমহাদেশ ভিত্তিক কেন্দ্রীয় পরিষদ নির্বাচনেরও কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

প্রদেশভিত্তিক পরিষদ গঠনের জন্য ১৯৩৬ সনেই সর্বপ্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ও দেশের বিশেষ পরিমাণের করদাতা ব্যক্তিরা তাতে ভোট দেয়ার সুযোগ লাভ করে। এতে বিভিন্ন দল টিকেট (মনোনয়ন) দিয়ে নিজেদের দলীয় সদস্যদেরকে ভোট প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করায়, তাদের জয়ী করার জন্য দলের পক্ষ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয় এবং দলীয় কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের দিয়ে প্রার্থীর পক্ষে ব্যাপক ক্যানভাস করানো হয়। বৃটিশ শাসনের অবসানের পর পাকিস্তান ও বাংলাদেশ পর্যায়ক্রমে এ রাজনীতিরই উত্তরাধিকার লাভ করে। গণতন্ত্রের নামে এ রাজনীতিই এখন চলছে দেশে। নানা মত ও পথের রাজনৈতিক দল গঠন, নির্বাচনে দলের প্রার্থী দাঁড় করানো, তার সাফল্যের জন্য দলের পক্ষ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ, স্বেচ্ছাসেবী (ভলান্টিয়ার) বাহিনী পাঠিয়ে ক্যানভাস করানো, টাকা দিয়ে ভোট ক্রয়- এই হলো বর্তমান গণতান্ত্রিক রাজনীতির সারকথা।

এ দৃষ্টিতে তখনকার ও বর্তমান রাজনীতির বিচার-বিবেচনা করা হলে এ দুয়ের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তব কাজের দিক দিয়ে কোনো মৌলিক পার্থক্যই লক্ষ্যগোচর হবে না। তখন প্রার্থী ভোটদাতাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে ভোট চাইত, এখনও চায়। তখন প্রার্থী জনগণের হাতে আকাশের চাঁদ তুলে দেয়ার ওয়াদা করত, এখনও করে। তখন দলের টিকেট নিয়ে প্রার্থী দাঁড়াতো, এখনও দাঁড়ায়। তখন দলীয় প্রার্থীর পক্ষে দলের তরফ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হতো, এখনও করা হয়। তখন দলীয় কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীরা প্রার্থীকে জয়ী করার জন্য কাজ করত, এখনও তা-ই করে। তখন দেখা হতো না প্রকৃত সার্বভৌমত্ব কার হাতে এবং প্রার্থীর বাস্তবিকই কিছু করার ক্ষমতা আছে কি না। এখনও তা দেখা হয় না। তখন জনগণকে মিথ্যা ওয়াদা দিয়ে ভোলানো হতো, এখনও ভোলানো হয়। তখন নগদ টাকা দিয়ে ভোট কেনা হতো, এখনও তা হয় । তখন যেমন জাল ভোট দেয়া হতো, ভোট বাক্স ছিনতাই হতো, এখনও তা হয়; বরং এখন তা হয় আগের তুলনায় অনেক অনেক বেশি- যাকে ব্যালট ডাকাতি বলাই অধিকতর শোভন, তার রূপ বা ধরন যাই হোক না কেন! তখনো নির্বাচিত হওয়ার পর সংসদ সদস্যরা জনগণের কল্যাণে কিছুই করতে পারত না, এখনও তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই করতে পারে না। কাজেই পরাধীনতার আমলের রাজনীতি ও স্বাধীনতার আমলের রাজনীতি অভিন্ন ও একাকার; এ দুয়ের মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই। আমার মতে দেশের প্রচলিত রাজনীতি পরাধীনতার প্রতীকই শুধু নয়, পরাধীনতার চরিত্রকে দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব দানকারীও। আর এজন্যই আমরা এ রাজনীতির ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। কেননা আমরা প্রকৃত স্বাধীনতার পক্ষে। পরাধীনতার সমস্ত চিহ্নকে চিরতরে মুছে ফেলাই আমাদের ঈমানের ঐকান্তিক দাবি।

২. দেশের প্রচলিত রাজনীতি যেমন পরাধীনতার চরিত্র সৃষ্টিকারী তেমনি তা ধর্মনিরপেক্ষতাভিত্তিক। ধর্মনিরপেক্ষতা- ইংরেজী পরিভাষায় যার নাম সেকিউলারিজম (Secularism)[৭] । সেকিউলারিজম হচ্ছে, খ্রিস্টান ইউরোপে সৃষ্ট একটি বিশেষ ধরনের মতাদর্শ। এটি বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণার ফসল। এতে শুধু বৈষয়িক ব্যাপারাদিই বিবেচনা ও গুরুত্ব লাভের অধিকারী। মানুষ যে এ জগতে এক বিশেষ ও

মহান মর্যাদাসম্পন্ন সৃষ্টি, তা এতে স্বীকৃত নয়; বরং মানুষকে মনে করা হয় জন্তু-জানোয়ারেরই অধঃস্তন বংশধর। জন্তু-জানোয়ারের যেমন কোনো নৈতিকতা, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ বা হালাল-হারামের বিবেচনা নেই, এই মত অনুসারে মানুষেরও তা থাকবে না। এতে যদিও ধর্মবিশ্বাস পোষণের ব্যক্তিগত সুযোগ আছে; কিন্তু তা ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তা ও ব্যক্তিগত পর্যায়ের কিছু ধরা-বাঁধা আনুষ্ঠানাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধর্মের কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না, কোনো প্রভাব চালানো যাবে না, দোহাই দেয়া চলবে না। ফলে পশুর ন্যায় ধর্মহীন জীবনকেই মনে করতে হয় মানুষের ললাট লিখন। কিন্তু আমরা এ চিন্তাকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, অসত্য, অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক মনে করি । তাই সেকিউলার রাজনীতিতে আমাদেরকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেখানে আমাদের উপস্থিতিকেও আমরা শাশ্বত ঈমানের পরিপন্থী মনে করি।

৩. বর্তমানে (১৯৮৫) দেশে যে রাজনীতি চলছে স্পষ্টতর ভাষায় বললে তা হচ্ছে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের রাজনীতি। অন্যকথায়, এ দেশে পূর্বে গণতন্ত্র কার্যকর ছিল, বর্তমানে এই সামরিক শাসনের আমলে সে গণতন্ত্র নেই।[৮] অতএব, তা পুনরুদ্ধার করতে হবে, এ-ই হচ্ছে এখনকার রাজনীতির সারকথা।

একথা ঠিক যে, বর্তমানে সামরিক শাসনে গণতন্ত্র' চালু নেই, অন্যকথায় পূর্বের ন্যায় জনগণ ভোট দিয়ে জাতীয় সংসদের নির্বাচন করছে না; নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য প্রভাবশালী নেতারা বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত নেই। যদিও এই সামরিক শাসনে অনির্বাচিত এক ব্যক্তির নিরংকুশ শাসন ক্ষমতার অধীনে এক ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীও হয়েছে, বিভিন্ন মন্ত্রীত্বে রাজনৈতিক ময়দানের বিভিন্ন দিকপাল ক্ষমতাসীনের ব্যক্তিগত দয়া ও অনুকম্পার দান হিসেবে- সেই ব্যক্তির গুণগান ও বিজয়গাথা প্রচার ও মোসাহেবী করার কাজে নিযুক্তি পাচ্ছে এবং পেয়ে নিজেদেরকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশে গণতন্ত্র নেই, একথা সর্ববাদীসম্মত। এমনকি তথাকথিত গণতান্ত্রিক উপায়ে কয়েক কোটি ভোটে নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে

জাতির মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করা টাকায় আলালের ঘরের দুলালের ন্যায় লালিত-পালিত ও বিশেষ ধরনের বেশভূষা ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বাহিনীর প্রধান হওয়ার সুযোগে সিংহাসন থেকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে সিংহাসন দখলকারী ব্যক্তি বলছেন, দেশে এখন গণতন্ত্র নেই বটে; কিন্তু আমি গণতন্ত্র বিরোধী নই। আমিই গণতন্ত্র দেবো। তবে তা দেয়ার প্রক্রিয়া কী হবে, তা নির্ধারণের জন্য তা দেয়ার পূর্বে আমার সাথে সংলাপে বসতে হবে।

তার অর্থ, গণতন্ত্র এমনই এক চীজ যে, এই মাত্র যে ব্যক্তি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার শিরচ্ছেদ করল, সেও গণতন্ত্রের বিরোধী নয়, সেও গণতন্ত্র দেবে বলে রস উপচানো সংলাপ চালাতে সদা প্রস্তুত। আর গণতন্ত্রবাদী রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের লোকেরা গণতন্ত্রের স্বাদ আস্বাদন করতে না পারলেও সংলাপের উপচানো রস আস্বাদনের জন্য বঙ্গভবন দখলকারী ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে হাজিরা দিতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করে না।

হ্যাঁ, গণতন্ত্র এক আজব চীজই বটে। কেননা তা সরাসরি এসেছে ইংল্যান্ড থেকে। নিশ্চয়ই এটি আমদানি করা এক পরম লোভনীয় বস্তু। ইউরোপেই এ বস্তুর আবিষ্কার, সেখানেই সর্বপ্রথম এর উৎপাদন। তার পরেই দুনিয়ার অন্যান্য দেশে এই বস্তুর রপ্তানি কার্য সম্পাদিত হয়েছে। আমাদের এ দেশে এ বস্তু রপ্তানি করা হয়েছিল ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইনের মোড়কে ভরে।

ইউরোপ তখন সামন্তবাদ থেকে রাজতন্ত্রে উত্তরণ লাভ করেছে, সে রাজতন্ত্রের উপর যদিও সামন্তবাদের ভূত পুরাপুরি চেপে বসেছিল। পরে এই রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভ-বিক্ষোভ এবং পরিণামে বিদ্রোহ দেখা দেয়। তখন ইউরোপ রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে উত্তরিত হয়, যদিও সে গণতন্ত্রের উপর প্রাচীন সামন্তবাদ ও পরবর্তী রাজতন্ত্রের ভূত পুরো মাত্রায়ই প্রভাবশালী হয়ে বসেছে। সে ভূত মানুষের উপর মানুষের নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও স্বেচ্ছাচারিতা, মানুষকে মানুষের দাসত্ব করতে বাধ্য করা- যেন তা সত্ত্বেও জনগণ মনে করতে থাকে যে, আমরা তো স্বাধীন!

বলা যেতে পারে, গণতন্ত্র তো স্বাধীনতার সনদ। এখানে দাসত্বের প্রশ্ন কী করে উঠতে পারে?

হ্যাঁ, কথাটি খুব সহজবোধ্য নয়, স্বীকার করছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলবো, গণতন্ত্র মানুষের দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী করার একটি বড় চাকচিক্যময় ফাঁদ- তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

গণতন্ত্রে সামন্তবাদ ও রাজতন্ত্রের ভূত রয়েছে, আমি বলেছি। কেননা সামন্তবাদ ও রাজতন্ত্রে ব্যক্তির নিরংকুশ কর্তৃত্ব প্রবলভাবে কার্যকর। গণতন্ত্রেও তাই। কেননা গণতন্ত্রে মৌলিকভাবে মানুষের নিরংকুশ সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত। বাহ্যত তাতে বহু লোকের নিকট ক্ষমতা বিভক্ত দেখা গেলেও মৌলিকভাবে তাতে এক ব্যক্তিরই ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা পছন্দ–অপছন্দের প্রাধান্য বিরাজমান। তাই গণতন্ত্র মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে এক বিন্দু মুক্ত করে না; বরং নূতন করে দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী করে- এ কথা সকল সংশয়ের ঊর্ধ্বে।

তাছাড়া বর্তমানে প্রচলিত রজানীতিতে গণতন্ত্র হচ্ছে একটি প্রচণ্ড ধোঁকা। এর ভিত্তিতে দেশে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। জনগণকে বোঝানো হয় যে, তারাই হচ্ছে দেশের ভাগ্য-নিয়ন্তা। তারা যা চাইবে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তা-ই বাস্তবায়িত হবে; কিন্তু এ সবই ধোঁকা, নিছক প্রতারণা মাত্র।

গণতন্ত্রে কার্যত তা কখনো হয় না। তাতে জনগণ বড়জোর একটা ভোট দেয়ারই অধিকার পায়; কিন্তু সেই ভোট লাভ করে যারা নির্বাচিত হয়, জনগণ আর তাদের নাগালের মধ্যে পায় না। তারা থাকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত জনগণের আর কিছুই করার থাকে না। তারা ভোট দেয়ার পূর্বে যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে যায় ভোট দেয়ার পরও। বস্তুত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তনই সম্ভব হয় না।

আমাদের এ ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে গণতন্ত্রের নির্বাচন তো বহুবার হলো; কিন্তু তার ফলে এখানকার জনজীবনে কোনো পরিবর্তন এসেছে বলে কি কেউ দেখাতে পারেন?"

প্রকৃতপক্ষে বর্তমান রাজনীতিতে গণতন্ত্র জনগণের অধিকার হরণের একটা মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে এক ব্যক্তি গণতন্ত্রের লড়াই করে করে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কিন্তু গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা লাভ করেই সে গণতন্ত্রেরই দোহাই পেড়ে গণঅধিকার হরণ করে নেয়। প্রথমে সারা দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে, তার পরে দ্বিতীয় বিপ্লবের' নামে জনগণের রাজনৈতিক ও মানবিক অধিকার হরণ করে এবং সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে একটি মাত্র দলে সকল মানুষের শামিল হওয়ার বাধ্যবাধকতা আরোপ করে।

ফলে বহু কাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্র নিমিষে স্বৈরতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়ে গেল। এটা কেমন করে হলো? হলো এজন্য যে, মৌলিক দৃষ্টিতে গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। উভয়ের মূলেই রয়েছে মানবীয় সার্বভৌমত্ব। আর মানবীয় সার্বভৌমত্ব কখনও ব্যক্তি ভিত্তিক চলে, কখনও চলে সমষ্টিভিত্তিক।

কেউ কেউ যুক্তি দেখাতে চায়, দেশে এখন (১৯৮৫) গণতন্ত্র নেই বলে আদর্শ প্রচারের কাজ করতে বড় অসুবিধা। তাই গণতন্ত্র হলে আদর্শ প্রচারের সুবিধা ও অবাধ অধিকার পাওয়া যাবে। কিন্তু এদেশের নিকট অতীতের ইতিহাস তাদের এ ধারণাকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন প্রমাণ করে। গণতন্ত্রবাদীরা গণতন্ত্রের নিয়মে নির্বাচিত হয়ে প্রথমেই যে গণতন্ত্র তথা গণ-অধিকারকে রাজপথে জবাই করে, তা কি এদেশের লোকেরা নিজেদের চোখে দেখেনি? নিশ্চয়ই দেখেছে। কাজেই এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়, গণতন্ত্র হলেও আদর্শ প্রচারে সুবিধা পাওয়ার কোনো আশা নেই।[১০] সুতরাং গণতন্ত্র ইসলামের পথ সুগম করে দেবে তা কেবল আহম্মক লোকেরাই মনে করতে পারে।

৪. গণতন্ত্রে নির্বাচন একটা বড় প্রতারণা মাত্র। ব্যাপারটা গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য। নির্বাচন দলভিত্তিক হোক বা নির্দলীয়, তাতে ব্যক্তিকেই প্রার্থী হতে হয় এবং ভোটদাতাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ভোট চাইতে অর্থাৎ ভোট ভিক্ষা করতে হয়।

কিন্তু ব্যক্তি কেন ভোট চাইবে? মানুষ যে জিনিসের মুখাপেক্ষী, যে দিক দিয়ে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত, ব্যক্তি সাধারণত তা-ই পাওয়ার জন্য কষ্ট স্বীকার

করে। প্রয়োজন তীব্র হলে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতেও সে দ্বিধাবোধ করে না- যখন আর কোনো উপায় থাকে না। কিন্তু ব্যক্তি- সে দলীয় বা নির্দলীয়- কেন লোকদের নিকট ভোট ভিক্ষা করবে? তার নির্বাচিত হওয়া কি তার নিজের জন্য প্রয়োজন, না জনগণের জন্য? জনগণের জন্য হলে তার তো বাড়ী বাড়ী ভোট ভিক্ষা করে বেড়ানোর প্রশ্ন উঠে না, জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাকে ভোট দেবে। সে রাজী না হলেও জনগণ প্রয়োজন মনে করলে তাকে রাজী করাবে তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য। তারাই তাকে বিজয়ী করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবে। অথচ এখানে হচ্ছে তার বিপরীত। শুধু তাই নয়, ভোট-প্রার্থীর ভোট ভিক্ষা এক মহাদুর্নীতি ও কঠিন স্বার্থপরতার ইঙ্গিত প্রদান করে। স্পষ্ট মনে হয়, তার নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার মূলে নিহিত রয়েছে তার নিজের স্বার্থ- জনস্বার্থ নয়। তার মনে ক্ষমতা লাভ বা কোনো-না-কোনো ভাবে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের লোভ উদগ্র হয়ে আছে এবং তার চরিতার্থতার জন্যই সে সদস্য নির্বাচিত হতে চাচ্ছে।

তাছাড়া ভোট পাওয়ার জন্য প্রচার-প্রোপাগান্ডা, ক্যানভ্যাসিং ইত্যাদির জন্য প্রার্থীকে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হয়- সে টাকা তার নিজের হোক বা দলের পক্ষ থেকে দেয়া হোক; কিন্তু কেন এই টাকা ব্যয়?

এ টাকা তার নিজের হলে প্রশ্ন হচ্ছে, এই লক্ষ লক্ষ টাকা শুধু ভোট কেনার জন্য সে কোথায় পেল? কেমন করে এত টাকা সে যোগাড় করল? তার ও পরিবারবর্গের দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণের পরও সে এত টাকা এ কাজে কেমন করে ব্যয় করতে পারছে? বিরাট পুঁজিপতি নিশ্চয়ই। সেক্ষেত্রে তাঁর এ বিপুল পরিমাণ টাকা সংগ্রহের মূলে প্রচ্ছন্ন রয়েছে শোষিত-বঞ্চিত লক্ষ লক্ষ নর-নারী, শিশু ও বৃদ্ধের হাহাকার। এহেন ব্যক্তির টাকা ব্যয়ের পরিণামে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর জনগণের সার্বিক কল্যাণ তো দূরের কথা, সাধারণ দু-একটি কল্যাণের কাজ করাও কি তার পক্ষে সম্ভব? আর সে তা করবেই বা কেন? সে তো নগদ মূল্যে সদস্যপদ ক্রয় করেছে। তা একান্তভাবে তার নিজের টাকা দিয়ে ক্রয় করা একটি সম্পদ। সুতরাং জনগণের কল্যাণের জন্য কিছু করতে কিংবা জনমতকে সমীহ করতে অথবা কোনো জনদাবি পূরণ করতে সে কোনোক্রমেই বাধ্য হতে পারে না।

পক্ষান্তরে, দল প্রার্থীর জন্য টাকা ব্যয় করলেও সে একই প্রশ্ন এবং একই পরিণতি। এ দুয়ের মাঝে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। তাছাড়া দলের কর্মীরা এক ব্যক্তির বিজয়ের জন্য শ্রম করবে কেন? সে যদি বিজয়ী হয়, তাতে কর্মীদের কী লাভ? হয়ত এটাই লাভ যে, তার কাছ থেকে পারমিট, লাইসেন্স ইত্যাদি পাওয়া যাবে। কিন্তু তা তো সকল ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বিরোধী দলের সদস্যের কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। তা হলে কর্মীরা কেন এক ব্যক্তির জন্য শ্রম করবে? অতএব এরূপ নির্বাচনের ফলে জনগণের যে কোনো কল্যাণই সাধিত হয় না। হওয়া সম্ভব নয়, তাতে এক বিন্দু সন্দেহের অবকাশ থাকে না।[১১]

৫. নির্বাচনের এ পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে পুঁজিবাদী। এতে অংশগ্রহণ ও ভোটযুদ্ধে জয়লাভ করে সদস্য নির্বাচিত হওয়া কেবল পুঁজিপতি ব্যক্তিদের পক্ষেই সম্ভব। আর রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সাথে অর্থনৈতিক পুঁজিবাদের যে ওতপ্রোত সম্পর্ক, তা তাত্ত্বিকভাবেও স্বীকৃত। আর এ কারণেই আজ পর্যন্তকার পুঁজিবাদী নির্বাচনসমূহের পরিণামে এদেশে বড় বড় পুঁজিপতিরই সৃষ্টি হয়েছে; তাদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পুঁজিবাদী শোষণমূলক এক নিকৃষ্ট অর্থব্যবস্থা। পক্ষান্তরে, জনগণের দারিদ্র্য-দশা একবিন্দু হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে ক্রমাগতভাবে তা মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করছে।

এ পুঁজিপতি রাষ্ট্রকর্তারাই আমাদের দেশটিকে পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশসমূহের নিম্নস্তরে নামিয়ে দিয়েছে। আমি বলবো, এই দেশটি মূলত কোনো দরিদ্র দেশ নয়। আমাদের এই দেশের পরতে পরতে, কন্দরে কন্দরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মহান আল্লাহর দেয়া অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ। পুঁজিপতিরা নগদ টাকা ব্যয় করে প্রথমে সংসদ সদস্য ও পরে রাষ্ট্র পরিচালক হয়ে নিজেদের সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধির চিন্তায় দিন-রাত মশগুল ও ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকে। দেশের এ সব সম্পদ কাজে লাগিয়ে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি এবং তার দ্বারা সাধারণ মানুষের অভাব মোচন ও জীবন-মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করার কোনো অবসর পায় না। সে চেষ্টাও তারা করে না, চেষ্টা করার প্রয়োজনও বোধ করে না। কেননা অভাব-অনটন ও দারিদ্র্যের জ্বালা যে কতখানি মর্মান্তিক, তা অনুধাবন করার সাধ্যও এদের নেই। এক্ষেত্রে পুঁজিবাদী রাজনীতি ও সমাজতন্ত্রবাদী

রাজনীতি সম্পূর্ণ একাকার- অভিন্ন। সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর সাধারণ দরিদ্র জনতার কথা তাদের কারোরই মনে থাকে না; কেননা তারা তো সকলেই এ সদস্যপদ নগদ টাকায় ক্রয় করেছে। এখন ব্যয় করা সে টাকা যেমন তুলতে হবে, তেমনি পাঁচ বছর পর আবার যে নির্বাচন হবে তাতে ব্যয় করার জন্যও তাকে অনুরূপ আরও অধিক টাকা সংগ্রহ করতে হবে। এ সব চিন্তায় প্রতিনিয়ত তাকে মশগুল ও ব্যস্ত থাকতে হয়। সরকার পক্ষের সদস্য হলে তো সুযোগের শেষ নেই; বিরোধী দলের হলেও তাকে নানান কৌশল অবলম্বন করতে হয়। এ শুধু টাকার খেলা, দুর্নীতির পথ উন্মুক্ত করার প্রতিযোগিতা মাত্র। এ কাজের প্রতি স্বভাবত আমাদের কোনো আকর্ষণ বা আগ্রহ নেই। অতএব এ কাজে আমরা নেই।

৬. বর্তমান গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ পুঁজিমালিকদের- সে ব্যক্তি হোক বা দল- এ যেন এক একটা লাভজনক ব্যবসা মাত্র। এ ব্যবসায়ে গরীব মানুষের পক্ষে অংশগ্রহণের কোনো প্রশ্ন উঠে না । প্রশ্ন উঠে না, সমাজের অপেক্ষাকৃত সৎ ও দরিদ্র মানুষের কল্যাণকামী নিঃস্বার্থ ব্যক্তিবর্গের পক্ষে। তাহলে একথা এক চিরন্তন সত্য হয়েই দাঁড়ায় যে, বর্তমান রাজনীতির পরিণামে কেবল পুঁজিপতিরাই সংসদ সদস্য ও রাষ্ট্র পরিচালনা বা রাষ্ট্রকর্তা নির্বাচিত হতে পারে। দরিদ্র ব্যক্তিরা যতই সৎ ও জনকল্যাণকামী হোক, তাদের পক্ষে প্রচলিত নির্বাচনে অংশগ্রহণ, নির্বাচনী অভিযান চালানো এবং সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়া ও ক্ষমতাসীন হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই যে রাজনীতির আওতায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কেবল পুঁজিপতিরাই নির্বাচিত ও ক্ষমতার অংশীদার হতে পারে তা ইসলামের দৃষ্টিতেও অকল্যাণকর এবং অবৈধ। অতএব তা গ্রহণযোগ্য নয়। তাই আমরা বর্তমান রাজনীতি ও তার আওতায় অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনী কার্যক্রমে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

৭. বর্তমান অবস্থায় এক একটি সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন ও ব্যবস্থাপনায় সরকারকেই বহু কোটি টাকা ব্যয় করতে হয় এবং তা সবই গরীব জনগণের অর্থে গঠিত জাতীয় ভাণ্ডার থেকেই ব্যয় হয়ে যায়। আর সেই সাথে প্রত্যেক প্রার্থীর ব্যয় করা বিপুল পরিমাণ অর্থ একত্র করা হলে

তার মোট পরিমাণ যে কত বিরাট হয়, তা সাধারণ মানুষের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই বিরাট পরিমাণ জাতীয় সম্পদ ব্যয় করার পর জাতীয় জীবনের কী কল্যাণটি সাধিত হয়? আজ পর্যন্তকার নির্বাচনের ফলে জাতীয় সমস্যাবলির একটিরও কি সমাধান হয়েছে? নির্বাচনী অভিযানে ব্যয় করা এ টাকা কোনো-না-কোনোভাবে সমাজের টাউট-বাটপার ও অপেক্ষাকৃত সচ্ছল লোকদের হাতে এসে যায়। এই বিপুল পরিমাণের নগদ টাকা বাজারে এসে হঠাৎ করে প্রচণ্ড মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য সহসাই বৃদ্ধি পেয়ে জনগণের ক্রয়ক্ষমতার অনেক ঊর্ধ্বে চলে যায়। ফলে জনজীবনে নেমে আসে কঠিন দুর্ভোগ।

যে নির্বাচনের ফলাফল এতখানি মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী, সে নির্বাচনের সুযোগ পাওয়ার জন্য আজ যারা রাজনৈতিক তৎপরতা চালাচ্ছে, দেশজুড়ে আন্দোলন করছে, তাদের মন-মানসিকতার অবস্থা পূর্বোক্ত প্রতিক্রিয়ার আলোকে বিশ্লেষণ করলে চরম হতাশার সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। স্পষ্ট মনে হয়, তারা জনগণকে শোষণ-লুণ্ঠন ও বঞ্চিত করে কিংবা বিদেশি পেট্রো-ডলারের মালিকদের নিকট হাত পেতে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করেছে যা ব্যয় করার কোনো ক্ষেত্রই তারা পাচ্ছে না। দেশে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে দিন কাটাচ্ছে, সামান্য বস্ত্রের অভাবে আব্রু ঢাকতে পারছে না, মানুষের বাসোপযোগী ঘর-বাড়ী নেই বলে গাছতলায়, নর্দমার পার্শ্বে, ঝুপড়িতে পরিবার-পরিজন নিয়ে পড়ে থাকছে পশুর চাইতেও নিকৃষ্ট অবস্থায়। তাদের জন্য এক পয়সা ব্যয় করতে এ টাকাওয়ালারা প্রস্তুত নয়। এই বঞ্চিতেরা যে মানুষ, তাদেরও যে জাতীয় অর্থ ও ধনীদের সম্পদে অংশ রয়েছে, সে কথা তারা বেমালুম ভুলে বসে আছে।

এ ধরনের লোকেরা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে কিংবা মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট হলে সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধিত হওয়ার কোনো আশা করা যেতে পারে কি? কোনো কল্যাণেরই আশা করা যায় না। তাই আমরা দেশের প্রচলিত রাজনীতিতেও নেই, নির্বাচনেও নেই। নেই এজন্য যে, এর ফলে জনগণের বিন্দুমাত্র কল্যাণ হয় না।

জাতীয় সমস্যাবলিরও এক বিন্দু সমাধান হয় না। দ্বীন ইসলাম কায়েম হওয়ার তো প্রশ্নই উঠে না।

৮. দেশের বর্তমান রাজনীতির ময়দানে যে সব দল বা জোট অত্যন্ত সক্রিয়, যাদের রাজনৈতিক তৎপরতাকেই রাজনীতি বলা হয়, তারা নির্বিশেষে সকলেই 'সেকিউলার'। তারা রাষ্ট্র ও জাতীয় জীবনে কোনোরূপ আদর্শিক পরিবর্তন আনার পক্ষপাতী নয়। তাদের রাজনীতির সারকথা হচ্ছে, 'হে এরশাদ! তুমি কোথেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছ। তুমি সরে দাঁড়াও। এদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আমাদের। পৈতৃক কিংবা স্বামীর উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া জিনিস। তার ভোগদখল আমরাই করবো। অন্যকথায়, নিছক ক্ষমতা দখলই তাদের রাজনৈতিক তৎপরতার একমাত্র লক্ষ্য। মূলত বর্তমান সরকার ও বিরোধী দল- জোটগুলোর মধ্যে আদৌ কোনো দ্বন্দ্ব থেকে থাকলে তা শুধু ক্ষমতার দ্বন্দ্ব- কোনো আদর্শিক মতপার্থক্যই এখানে নেই। ক্ষমতাসীন ব্যক্তি যেমন সেকিউলার' বিরোধী দলজোটগুলোও তেমনি সেকিউলার।[১২]

এরশাদও বর্তমানে (১৯৮৫) রাজনৈতিকভাবে বিশেষ তৎপর। তার তৎপরতার সারকথা হচ্ছে, ক্ষমতা আমার হাতে। আমিই দেশের সর্বেসর্বা। (ফেরাউন যেভাবে দাবি করেছিল "আমিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।") তাই যে গণতন্ত্র আমার ক্ষমতাকে বিপন্ন করতে পারে বলে আশংকা হবে, তা আদৌ গণতন্ত্র নয়। যে গণতান্ত্রিক নির্বাচন আমাকে দেশের 'নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট' হবার সুযোগ দেবে, তা-ই প্রকৃষ্ট নির্বাচন এবং তখনই দেশে গণতন্ত্র হলো বলতে হবে। তার নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ, জনদল গঠন, কয়েক দল নিয়ে ফ্রন্ট গঠনের চেষ্টা, শেষ পর্যন্ত জাতীয় পার্টি গঠন ইত্যাদি একমাত্র সে উদ্দেশ্যেই নিবেদিত। এ উদ্দেশ্য পূরণ হলে ক্ষমতা ছাড়ার কথা তো নয়ই বরং ক্ষমতায় অংশীদার বানাতে পারেন তাদেরকে যারা তাকে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বানাবার লক্ষ্যে গঠিত দলে শামিল হবে।

এককথায়, বর্তমান রাজনীতি হচ্ছে ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি' তথা ক্ষমতা দখলের লড়াই। আমরা রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ে এই কাড়াকাড়িকে অত্যন্ত জঘন্য দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পক্ষে মারাত্মক এবং সম্পূর্ণ

নাজায়েয কাজ মনে করি। ক্ষমতা নিয়ে এ কাড়াকাড়ি জাতিকে চরম দুর্দশার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। তাই প্রচলিত রাজনীতিতে আমাদের অনুপস্থিতি সর্বতোভাবে স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত।

৯. দেশের প্রচলিত রাজনীতিতে আমরা এ সব কারণেই অনুপস্থিত। তাছাড়া ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে যারা ক্ষমতায় বসে, তাদের ক্ষমতা থেকে ফেলে দিতে অস্ত্রধারী সামরিক বাহিনীর একটুও সময় লাগে না। কারণ যে ভোট পেয়ে ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতায় এসেছে তা দেশের সমগ্র ভোটারের দশ ভাগের এক ভাগও নয়। তদুপরি এ ভোট জোর-জবরদস্তি করে অথবা লোভ-প্রলোভন দেখিয়ে অথবা জাল ভোটের মাধ্যমে আদায় করা হয়, যার সাথে ভোটারের হৃদয়ের কোনো সম্পর্ক থাকে না। থাকে না ঈমানের কোনো সম্পর্ক। তাই দেশে কোনো অভ্যুত্থান হলে জনগণ থাকে নির্লিপ্ত। বারবার এ অবস্থাই আমরা প্রত্যক্ষ করছি।

১০. যে সব রাজনৈতিক ব্যক্তি বা দল বর্তমান প্রচলিত রাজনীতিতে বিশেষভাবে তৎপর; তাদের মধ্যে দু'টি দল সম্পর্কে জনমনে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। একটি দল দেশে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে, অপরটি নাম ও মুখে 'ইসলামী' পরিচয় ব্যবহার করছে। কমিউনিজম প্রতিষ্ঠাকামী ও ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামী- এ দু'টি দলই কমিউনিজম ও ইসলামের মধ্যে রাতদিন ও আলো-আঁধারের চিরন্তন পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও গণতন্ত্রকে নিজেদের লক্ষ্য অর্জনের একমাত্র পথ বলে প্রচার করছে; অথচ কমিউনিজম সম্পর্কে কার না জানা আছে যে, তাতে গণতন্ত্রের কোনো স্থান নেই, গণতান্ত্রিক উপায়ে তা প্রতিষ্ঠিত হয় বলেও তার চিন্তানায়করা কোনো দিন বলেনি, বরং তার নীতিতে সশস্ত্র বিপ্লবই হচ্ছে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ। কিন্তু এরা সে পথে না গিয়ে পুঁজিবাদীদের সাথে মিলে রাজনৈতিক জোট বানিয়েছে। .... তা হলে বিপ্লবের কথা কি তারা ভুলে গেছে? ব্যাঘ্র কি ছাগল হয়ে ঘাস খেতে শুরু করল নাকি? ..... না, এটা তাদের একটা কৌশল- একটা ছদ্মবেশ?

'ইসলামী' বলে পরিচিত দলটি সম্পর্কেও এই প্রশ্ন। ১৯৪১ সনে আলীগড়ের স্ট্রেচী হলে প্রদত্ত 'ইসলামী বিপ্লবের পথ' শিরোনামের ভাষণ যে দলটির সৃষ্টি করল, সে দলটি কীভাবে কারোর ভাষায় সমালোচিত ও

পরিত্যক্ত ধর্মহীন গণতন্ত্র উদ্ধারের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে, তা জনগণের বোধগম্য নয়। পাশ্চাত্যের ধর্মহীন গণতন্ত্রের সাথে দ্বীন ইসলামের কোনো সম্পর্ক আছে নাকি? না, এটাও তাদের সেকিউলার কৌশল?

এসব কারণে গণতন্ত্র উদ্ধারের প্রচলিত রাজনীতিটি ইসলামের পক্ষের লোকদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। আমাদের মতে, ইসলামের দৃষ্টিতে এ 'গণতন্ত্র' একটি কুফরী আদর্শ। এতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব নয়, মানুষের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত। আর আমরা যেহেতু আল্লাহর অবিভাজ্য, শাশ্বত সার্বভৌমত্বের প্রতি ঈমানদার, তাই তথাকথিত মানবীয় সার্বভৌমত্বভিত্তিক গণতন্ত্র উদ্ধারের প্রচলিত রাজনীতিতে আমরা নেই। আমাদের এখানে না থাকাটা খুব স্পষ্টরূপে ঈমানের ব্যাপার। আর মনে রাখতে হবে, সেকিউলার কৌশলের সাহায্যে অন্য কোনো তন্ত্র-মন্ত্র কায়েম হলেও ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয় না। হলে আল্লাহর রাসূল প্রাণান্তকর কষ্ট স্বীকারের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতেন না।

১১. বর্তমানে (১৯৮৫) যে সব রাজনৈতিক দল নির্বাচনে শরীক হওয়ার জন্য অস্থির ও উদগ্রীব, তারা যেমন বর্তমান সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী-পদে আসীন রয়েছে, তেমনি রয়েছে বিরোধী শিবিরেও। সরকার পক্ষের লোকদের, বিশেষ করে মন্ত্রীদের একটা লজ্জা ও সংকোচের ব্যাপার হচ্ছে, তারা ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত নন, অথচ মন্ত্রী হতে হলে আগে জনগণের সমর্থন ও বিজয়সূচক ভোটপ্রাপ্তি জরুরি। কিন্তু বর্তমানে তারা কেবল এক ব্যক্তির অনুকম্পার পাত্র হিসাবে মন্ত্রী পদে অভিষিক্ত। অনুকম্পাকারী ইচ্ছা হলে যে কোনো মুহূর্তে তাদের তাড়িয়ে দিতে পারে। (সামরিক সরকারের বানানো প্রধানমন্ত্রী সাহেবের পদচ্যুতিতেও কি তাদের আক্কেল হয়নি?) তাই তাদের জন্য গণতন্ত্র' অর্থাৎ সাধারণ নির্বাচন একান্ত দরকার। তাহলে তারা সহজেই নির্বাচিত হতে পারবে; কেননা তারা ক্ষমতাসীনের অত্যন্ত বশংবদ। ভোটারবৃন্দ ভোট না দিলেও তাদের বাক্স ব্যালট' ভর্তি হতে ও শেষে বিজয়ী বলে ঘোষিত হতে কোনো অসুবিধা হবে না। অতএব গণতন্ত্র, অর্থাৎ নির্বাচন যত তাড়াতাড়ি হয়, তাদের মান রক্ষার জন্য ততই মঙ্গল।

এ কারণে তাদের গণতন্ত্র চাওয়ার ব্যাপারটি জলবৎ তরলং। কিন্তু বিরোধী দল ও জোটসমূহ কি কারণে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানাচ্ছে, তা বোঝা গেল না। তারা কি জানে না যে, তাদের কেবল সেই প্রার্থীই নির্বাচিত হবে যার প্রতি ক্ষমতাসীনের অনুকম্পা হবে; এ জন্য যে, ভবিষ্যত সংসদের বিরোধী বেঞ্চে তার মতো একজন লোকের উপস্থিত থাকা দরকার। অবশ্য তার প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতাসীনের জন্য অপরিহার্য ব্যক্তিত্ব হলে সেও (অর্থাৎ বিরোধী প্রার্থী) নির্বাচিত হতে পারবে না; তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভোট না পেলেও সে নির্বাচিত হবে। বিরোধী দলীয় প্রার্থী বাক্স ভর্তি ভোট পেয়ে নির্বাচিত বলে ঘোষিত হলেও পরে বলা হবে, গুনতিতে ভুল হয়েছে। এই কথাকে অসত্য বলার মতো বুকের পাটা কারো আছে কি? '৭৩ সনে, '৭৯ সনে এবং '৮১ সনে কি তা-ই হয়নি? গণভোট নামের প্রহসনে এবং উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচনেও কি তা-ই ঘটেনি? আগামী প্রেসিডেন্ট ও সংসদ নির্বাচনেও যদি আদৌ তা হয়- ঠিক তা বা ভয়াবহ ধরনের চাইতেও কারচুপি হবে না, তার নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারেন কি?[১৩]

দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজন

না, সে নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না। পারে না যে, তা' '৮৬ সনের ৭ই মে অনুষ্ঠিত তথাকথিত সংসদ নির্বাচন বাস্তবভাবেই প্রমাণ করেছে। ('৮৫ সনের ২৬শে অক্টোবরের নির্বাচন সম্পর্কে যা যা বলেছিলাম '৮৬ সনের ৭ই মে'র নির্বাচনে সে সব কথাকে পরম সত্যরূপে প্রমাণ করে দিয়েছে।)[১৪] এ নির্বাচন ছিল নীলনকশার নির্বাচন। এ নির্বাচন হয়েছে বিদেশী শক্তির প্ল্যান-প্রোগ্রাম অনুযায়ী এবং সে প্ল্যান-প্রোগ্রাম হচ্ছে বাংলাদেশে রুশ-ভারত অক্ষশক্তির অধীন। একটি তাঁবেদার রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করা। এ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত নির্বাচন ভোটদাতাদের ভোটের মাধ্যমে হয় নি, হয়েছে প্রার্থীপক্ষের কর্তৃপক্ষীয় বিভিন্ন বাহিনীর উপস্থিতির জোরে, তাদের সাহস ও সমর্থন পেয়ে কর্মীদের মাধ্যমে ভোট বাক্সে ইচ্ছামত সীল দিয়ে ব্যালটপত্র ঢুকিয়ে। এটা ভোট যুদ্ধ ছিল না, ছিল ব্যালট যুদ্ধ। যা গণনা করা হয়েছে, তার শতকরা দশটাও ভোট ছিল না, ছিল ঢোকানো ব্যালটপত্র। তা শত শত নয়, হাজার হাজার।

একেকজন প্রার্থী লক্ষাধিক (ভোটে নয়) ব্যালটপত্রে জয়ী হয়েছেন এবং তাদের নিকটবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বীর ব্যালটপত্র ছিল লক্ষাধিকের মুকাবিলায় ৫০-৬০ হাজার। অথচ এলাকার মোট ভোটের সংখ্যা (মুদ্রিত তালিকা অনুযায়ী) লাখ-সোয়া লাখের বেশি হবে না। তাহলে কি ধরে নিতে হবে, তালিকা অনুযায়ী সমস্ত ভোটার পুলিং বুথে এসে ভোট দিয়ে গেছেন? না, যে কোনো এলাকার যেকোনো নাগরিক ভোটারকে জিজ্ঞেস করুন, কত পার্সেন্ট ভোটার ভোট দিতে গেছেন? জবাব শুনবেন, শতকরা ৭-৮ জনের বেশি নয়। তাহলে এই ব্যালটপত্রগুলো এল কোত্থেকে? নিশ্চয়ই প্রার্থী পক্ষের লোকেরা তা ঢুকিয়েছে। অনেক ভোটকেন্দ্রেই এমন হয়েছে যে, প্রকৃত ভোটার ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হলে তাদেরকে বলা হয়েছে, বাড়ি যান, আপনার ভোট দেয়া লাগবে না, আগে দেয়া হয়ে গেছে।' এই ব্যালট যুদ্ধে শরীক প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ বলেছে, জাতীয় পার্টি কারচুপি করেছে। জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, কারচুপিতে আওয়ামী লীগ সিদ্ধহস্ত, ওরাই বেশি কারচুপি করেছে। জামায়াত বলেছে, আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি উভয়ই ব্যাপক কারচুপি করেছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, জামায়াতও যে ভোট কারচুপি করতে পারে, তা এই প্রথম দেখলাম।

এর অর্থ নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে এবং তাতে কম-বেশি সবাই চরম প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। তাছাড়া অস্ত্রের ঝনঝনানি, বড় বড় রামদাও, বল্লম, ছোরা, পিস্তলে ব্যাপক প্রদর্শনী এবং কোথাও কোথাও তার ব্যাপক ব্যবহারও হয়েছে।

এই যা কিছু হয়েছে, তা সবই ছিল অবধারিত। বৃটিশ প্রবর্তিত গণতান্ত্রিক নির্বাচনে এ না হয়ে পারে না। এ জন্য কাউকে বিশেষভাবে দোষী করে লাভ নেই। গণতন্ত্রের এই নিয়মে যতবারই নির্বাচন হবে, তাতে এটা ঘটবেই; এ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব নয়। আর তা ঘটবে সরকারের ইচ্ছানুযায়ী, তা যে সরকারই ক্ষমতায় থাকুক না কেন।[১৫]

এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, নির্বাচনে শরীক যে দল যতটা আসনই পেয়েছে, তা পেয়েছে এ জন্য যে, কর্তৃপক্ষ তাকে সেই ক'টি আসনই দিতে চেয়েছে। তার অধিক আসন দেয়ার সিদ্ধান্ত ছিল না বলেই তা দেয়া হয়নি।

কাজেই বৃটিশ প্রবর্তিত তথাকথিত গণতন্ত্র এবং সেই গণতন্ত্রের নির্বাচন দ্বারা জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি নির্বাচন কখনই সম্ভব হবে না। একথা আজ নিঃসন্দেহ বাস্তব ঘটনাবলির ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়ে গেল। আমাদের মতে তাই এ গণতন্ত্রকে উৎখাত করতে হবে। এ গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণ পরিহার করে গণচেতনা ও গণঐক্যের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করতে হবে। ঘটাতে হবে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বিপ্লব।

আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা বলে যে, এর সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। কেননা গণতন্ত্রের পথে কেউ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলেও তার পক্ষে কোনো কিছু করা আদপেই সম্ভব হবে না- না আদর্শিক দিকে কিছু, না জনকল্যাণমূলক কিছু; বরং সত্যি কথা হচ্ছে বর্তমান প্রশাসনিক অবস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে দেশের অবস্থায় কার্যত কোনো পরিবর্তনই আসবে না। যার হাতে ক্ষমতা রয়েছে, তার হাতেই তা থেকে যাবে। অবশ্য তাতে তার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট (?) হওয়ার খাহেশটা পূরণ হবে। বেআইনী, অবৈধ শাসনকে জনসমর্থনের দোহাই দিয়ে বৈধ ও আইনসম্মত সরকার বলে দুনিয়ায় প্রচার চালানো যাবে। তা-ই হয়েছে। বলা হবে, দেশবাসী তাকেই সমর্থন করে, তার বিরোধীদের কোনো জনসমর্থন নেই। অথচ এর মতো ধাপ্পাবাজি আর কিছু হতে পারে না। আমরা মিথ্যাকে সত্য করা, অবৈধকে অন্যায়ভাবে বৈধ করার, সর্বোপরি এই ধাপ্পাবাজির ইন্ধন যোগানোর কাজে কোনো সহায়তাই করতে প্রস্তুত নই। তাই নিরপেক্ষ বা 'কেয়ারটেকার সরকারের অধীন নির্বাচন চাই' বলে চিৎকার করতেও আমরা রাজী নই। কেউ কেউ হয়ত মনে করেন যে, ইসলামী আন্দোলনের অংশ হিসাবে নির্বাচনে অংশ নিলে জনগণের নিকট কথা পৌঁছাবার একটা বড় সুযোগ পাওয়া যায়।

আমি বলবো, প্রচলিত নির্বাচন কেবল গণতন্ত্রবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের অংশ হতে পারে, ইসলামী বিপ্লবী আন্দোলনের নয়। কেননা নির্বাচনকালে যে সব কথা বলতে হবে, তার সাথে ইসলামী বিপ্লববাদীর কথার এক বিন্দু মিলই হতে পারে না। নির্বাচনে ভোট পাওয়ার লক্ষ্যে বলা কথা বিপ্লবী কথা নয়, গণতান্ত্রিক কথা। আর নির্বাচনের ফলে অনিবার্যভাবে যখন পরাজয় বরণ করা হবে, তখন দেশবাসী ও বিজয়ীরা বলবে এদেশের লোকেরা ইসলাম চায় না। চাইলে ইসলামের পক্ষেই তারা

ভোট দিত। (হাফেজ্জী হুজুরের নির্বাচনে লজ্জাকর ব্যর্থতা বাস্তবে তা-ই প্রমাণ করেছে)।[১৬]

১২. সর্বোপরি এ পথে আর যা-ই হোক, দ্বীন-ইসলাম কায়েম হওয়া সম্ভব নয়। দ্বীন-ইসলাম যেহেতু পূর্ণাঙ্গ, তা কায়েম করার পন্থা ও পদ্ধতিও তার ইসলামের) নিজস্ব। ধার করা কোনো পন্থায় বিশেষ করে কুফরী নীতি ও অনৈতিক পন্থায় ইসলাম কায়েম হতে পারে না। বর্তমানে প্রচলিত নির্বাচন ক্ষতি যে ধর্মনিরপেক্ষ, অর্থাৎ ধর্মহীন ইউরোপ থেকে গৃহীত পন্থা, তা আগেই বলেছি। তাই যে পথে ইসলাম কায়েম হবে না সে পথে একটি মুহূর্ত, একটি পয়সা এবং একবিন্দু শক্তি-ক্ষমতা ব্যয় করা আমাদের ঈমানের পরিপন্থী।

জিহাদই কাম্য

তাই আমরা প্রচলিত রাজনীতিতে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। আগেই বলেছি, আমাদের এ অনুপস্থিতি আমাদের দ্বীন ও ঈমানের সাথে পুরাপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। তাতে উপস্থিত থাকাই বরং ঈমানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কাজ।

আমরা প্রচলিত রাজনীতির ময়দানে অনুপস্থিত। তাহলে আমরা কোথায়, কোন ক্ষেত্রে উপস্থিত? আমরা কি দ্বীনের ও দেশের বিষয় চিন্তা-ভাবনা ত্যাগ করে ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছি?

না, আমরা নিষ্ক্রিয় নই। আমরা ঘরের কোণায়ও আশ্রয় নিইনি। আমরা যা করছি তা প্রচলিত রাজনীতি নয়, এক কথায় তা হচ্ছে জিহাদ-আল্লাহর পথে।

"জিহাদ" শব্দের শাব্দিক অর্থ : নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো। আর কুরআনী পরিভাষায় তার অর্থ : আল্লাহর আনুগত্য ও তার দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা চালানো। এখানে কেবল জিহাদই নয়, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ– আল্লাহর পথে জিহাদ। অর্থাৎ এই চেষ্টা-প্রচেষ্টা হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের

উদ্দেশ্যে। ইহকাল ও পরকালে এবং তা চলতে হবে আল্লাহ নির্দেশিত পথে, আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ম-বিধান অনুযায়ী।

প্রচলিত রাজনীতি আমরা করছি না। কেননা তা করার জন্য আল্লাহ আমাদের আদেশ করেন নি। পক্ষান্তরে, আমরা 'জিহাদ' করছি এ জন্য যে, মহান আল্লাহ তা করার জন্য আমাদেরকে আদেশ করেছেন। বলেছেন :

وَجَاهِدُوْا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

> তোমরা জিহাদ করো তোমাদের ধন-মাল ও জান-প্রাণ বিনিয়োগ করে, আল্লাহর পথে। তোমরা যদি জানো-বুঝ, তাহলে এই কাজই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, সর্বাধিক কল্যাণময়। (সূরা আত তাওবা : ৯১)

বস্তুত জিহাদ অর্থ মারামারি, কাটাকাটি নয়। জিহাদ অর্থ সর্বাত্মক চেষ্টা, কষ্ট স্বীকার, লক্ষ্য অর্জনের সাধনা-সংগ্রামে সকল শক্তি নিয়োগ করা। জিহাদের লক্ষ্য আল্লাহ-বিরোধী সকল শক্তি দমন করা, পরাভূত করা এবং সকল প্রকার খোদাদ্রোহী প্রতিষ্ঠানকে উৎখাত করে সর্বক্ষেত্রে এক মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও আইন-বিধান পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত করা; আল্লাহর দ্বীন কার্যত প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর করা।

এজন্য ব্যক্তিগণের প্রথম কাজ হচ্ছে নিজেদের নফস তথা মন-মানসিকতাকে আল্লাহর অধীন ও অনুগত বানানো। দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে, স্বীয় পরিবার-পরিজনকে আল্লাহর অনুগত বানানো এবং শেষ পর্যায়ের কাজ হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্রকে আল্লাহর অধীন ও অনুগত বানানো।

এ কাজে প্রথম বাধা আসে নিজের নফসের দিক থেকে। কেননা নফস মানুষকে খোদাদ্রোহিতায় উদ্বুদ্ধ করে এবং নাফরমানির কাজ করতে প্ররোচিত করে। তাই প্রথমে নফসই যদি আল্লাহর অধীন ও অনুগত হয়, তাহলে সেই নফসই মানুষকে পরবর্তী ক্ষেত্রসমূহে আল্লাহ বিরোধী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি যোগাবে।

জিহাদের এই মৌল দর্শন আমরা রাসূলে করীম (সা.)-এর কর্মনীতিতে পুরোপুরি প্রতিফলিত দেখতে পাই। তিনি মক্কী জীবনের তেরটি বছর নিজে ও ইসলাম গ্রহণকারীদের নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন করে সকলকে নিয়ে মদীনায় হিজরত করেন এবং এখানে তিনি এক পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেন।

বস্তুত রাসূলে করীম (স) প্রতিষ্ঠিত এ সমাজ ও রাষ্ট্র ছিল আল্লাহর সার্বভৌমত্বভিত্তিক এবং তার বিধান কুরআন মজীদের পুরাপুরি অনুসারী। এই সমাজের নাগরিকগণ ছিলেন কুরআনের মানদণ্ডে তৈরি প্রকৃত মুজাহিদ। তাদের পরিচিতি স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই দিয়েছেন এই ভাষায় :

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَه أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَه فَاٰزَرَه فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيْمًا ـ

মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল। আর যারা তার সঙ্গী-সাথী, তারা কাফির ও কুফরীর বিরুদ্ধে অত্যন্ত অনমনীয়, কঠোর এবং পরস্পরের প্রতি অতিশয় দয়াবান। তুমি (যখনই) তাদের প্রতি তাকাবে, দেখবে তারা অবনত, আত্মসমর্পিত। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় রত আর আত্মসমর্পণের চিহ্নই তাদের মুখমণ্ডলে দীপ্ত প্রতীক। (সূরা আল-ফাতহ : ২৯)

তাঁরা নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অনুগত বানিয়ে নিয়েছিলেন নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। ফলে তাদের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল বাইরের

আল্লাহদ্রোহী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই করা এবং সকল প্রকার মানবীয় সার্বভৌমত্বভিত্তিক রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানাদির মূলোৎপাটন করা। তারাই পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়িত করেছিলেন আল্লাহর এই নির্দেশ :

قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ-

> তোমরা (সশস্ত্র) যুদ্ধ করো ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে, যেন অনৈসলামী অবস্থা ও বিশৃঙ্খলা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে যায় এবং সার্বভৌমত্ব (ও তার মুকাবিলায় আনুগত্য) সম্পূর্ণরূপে ও একান্তভাবে আল্লাহরই প্রতিষ্ঠিত হয়। (সূরা আনফাল : ৩৯)

রাসূলে করীম (স)-এর জীবনে আমরা দেখতে পাই, তিনি মক্কা থেকে মুসলমানদের নিয়ে মদীনায় একত্রিত হলেন। মদীনায় প্রাচীন বাসিন্দাদের মধ্যেও ইসলাম গ্রহণকারী লোক ছিলেন। উভয় শ্রেণীর লোকদের সমন্বয়ে এক ঐক্যবদ্ধ আদর্শপরায়ণ লোকসমষ্টির সমাবেশ ঘটলো। ফলে মদীনা জনপদের প্রাচীন অধিবাসীরা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে নেতা ও বাদশাহ বানানোর যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, তা সম্পূর্ণরূপে বানচাল হয়ে গেল এবং সেখানে নবী করীম (সা.)-এর নেতৃত্ব এমনভাবে কায়েম হলো যে, মদীনা সনদের ভিত্তিতে ইয়াহুদী সমাজও তা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

আধুনিক ভাষায় বলতে গেলে আমি বলতে চাই, একটি আদর্শবাদী ঐক্যবদ্ধ সমাজ-সমষ্টি তার ব্যক্তিদের সংখ্যা যাই হোক সাধারণ গণমানুষকে আদর্শ সচেতন বানিয়ে আদর্শের ভিত্তিতেই ঐক্যবদ্ধ করতে পারে– পারে এই আদর্শ-সচেতক ব্যক্তি-সমষ্টি একটি অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হয়ে গণ-অভ্যুত্থান সৃষ্টি করতে– পারে বাতিল, গায়ের ইসলামকে খতম করে ইসলামী আদর্শকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করতে। আমরা আধুনিক ভাষায় একেই বলি ইসলামী বিপ্লব।

এ পথ যে কিছুমাত্র কুসুমাস্তীর্ণ নয়, এ পথে যে কঠিন দুরতিক্রম্য ঘাঁটি ও বাঁকসমূহ রয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রতিষ্ঠিত শক্তি যে এ কাজে প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়াবে, এ প্রচেষ্টাকে অংকুরেই বিনষ্ট করে দেবে–

দিতে চাইবে, তাও অকল্পনীয় নয়। কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে মহান আল্লাহর বাণী:

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

> আর যারাই আমার দিকে, আমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জিহাদ করবে আমরা তাদেরকে আমাদের পথসমূহ অবশ্যই দেখাব- পরিচালিত করব। আর আল্লাহ নিশ্চিতভাবেই রয়েছেন মুহসিন– ঐকান্তিক অনুগত ও নিষ্ঠাবান লোকদের সঙ্গে। (সূরা আনকাবুত : ৬৯)

বস্তুত এ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার ঘোষণা এবং এ ঘোষণা কেবল আল্লাহর পথে জিহাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। জিহাদে অবতীর্ণ হলেই তা পাওয়ার প্রশ্ন; গণতন্ত্র উদ্ধারের প্রচলিত রাজনীতি করলে সেক্ষেত্রে এর কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

আর এ জিহাদে অবতীর্ণ হলেই শহীদ হওয়া কিংবা গাজী হওয়া সম্ভব। 'শাহাদাত' কেবল আল্লাহর পথে জিহাদেই লাভ করা সম্ভব। আমরা গাজী হতে না পারি, নিয়ত খালেস হলে শাহাদাত তো পেতে পারি। সে পাওয়া এ দুনিয়ার রাজত্ব পাওয়ার তুলনায় অনেক বড় পাওয়া। দুনিয়ার রাজত্ব পাওয়ার সাথে তার কোনো তুলনাই হতে পারে না। এক্ষেত্রে কারোর প্রার্থী হওয়ার, ভোট ভিক্ষা করার, ক্যানভাস করার বা টাকা দিয়ে ভোট কেনার কোনো প্রশ্ন নেই, অবকাশও নেই। জনগণ স্বত:স্ফূর্তভাবে বাছাই করে নেবে তাদের নেতা। ইসলামী জিহাদের ফলে প্রতিষ্ঠিত খিলাফত ব্যবস্থায় নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব হবে।

তাই আমাদের নিকট প্রচলিত রাজনীতি নয়– জিহাদই কাম্য। এই জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য আমরা আকুল আহ্বান জানাচ্ছি এ দেশের কোটি কোটি মানুষকে।

সংঘবদ্ধ জনতার শক্তি

এ লক্ষ্যে আমরা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করছি। ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াত তাদের সামনে পেশ করছি। যে কালেমা পড়ে আমরা মুসলমান হই, ইসলামের সেই মূলমন্ত্র কালেমা তাইয়্যেবার বিপ্লবী অর্থ জনগণকে জানাতে চেষ্টা করছি; তা আয়ত্ত করতে মনমগজে দৃঢ়ভাবে বসাতে ও সে অনুযায়ী জীবন যাপন করতে বলছি। কুরআনের দারস পেশ করে ইসলামের মূল আদর্শ ও শিক্ষাকে সাধারণ্যে ব্যাপক প্রচার করতে চেষ্টা করছি এবং এ লক্ষ্যে কাজ করতে প্রস্তুত লোকদেরকে স্থানীয়ভাবে সদস্য হিসাবে সংঘবদ্ধ হয়ে উঠতে বলছি। এভাবে সারা দেশের সংঘবদ্ধ জনতাই পরিশেষে একটি শক্তিতে পরিণত হবে এবং এ শক্তিই ইসলামী বিপ্লবের দ্বার উন্মুক্ত করবে।

[১৯৮৫ সনের ২৬ শে অক্টোবর ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে প্রদত্ত ভাষণের লিখিত রূপ]

টীকা

১. স্মর্তব্য, একথা বলা হয়েছিল ১৯৮৫ সনের শেষ দিকে। এর পরবর্তী পাঁচ বছরে দেশের বেসামরিক শাসন চালু থাকলেও চরিত্রের দিক দিয়ে তা সামরিক শাসন থেকে ভিন্নতর কিছু ছিল না।

২. ১৯৯১ সালে সংবিধান সংশোধন করে সংসদীয় পদ্ধতি চালু করার পর থেকে এই ক্ষমতা ভোগ করছেন সরকার প্রধান।

৩. ১৯৯১ সালের পর অবশ্য বিচার ব্যবস্থাকে আবার কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে।

৪. এ কথার সময়-কাল ১৯৮৫।

৫. ১৯৮৬ ও '৮৭-এর সংসদ ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনও একই রূপ প্রহসনে পর্যবসিত হয়েছে ভোটারবিহীন ভোট গণনার দরুন।

৬. ১৯৮৫ সালে একথা বলা হয়েছে।

৭. শব্দটির অভিধানিক অর্থ হলো- রাজনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি ইত্যাদি ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার মতবাদ।

৮. উল্লেখ্য যে, কথাটি বলা হয়েছে ১৯৮৫-এর বিরাজমান পরিস্থিতিতে, যার সাথে বর্তমান অবস্থার বাহ্যিক মিল না থাকলেও চরিত্রগত মিল রয়েছে।

৯. এ প্রসঙ্গে ১৯৫৪, ১৯৭০, ১৯৭৩, ১৯৯১ এবং ১৯৯৬-এর গণতান্ত্রিক নির্বাচনের অভিজ্ঞতা এখানে স্মর্তব্য। পরবর্তীকালে ২০14 এবং ২০18 সালের নির্বাচনে একই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

১০ ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পর থেকে ঐ যুক্তি প্রদর্শনকারীরাই একথার যথার্থতা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে, যদিও এখন পর্যন্ত তাদের মোহমুক্তি ঘটেনি।

১১ দেশে বর্তমান গণতন্ত্র সংসদের সদস্যবর্গের কর্মতৎপরতা পর্যালোচনা করলেই একথার সত্যতা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হবে।

১২ কথাটি ১৯৮৫ সালের প্রেক্ষাপটে বলা হলেও দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও এটি সম্পূর্ণ প্রযোজ্য।

১৩ এমনকি ১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০৮ সালে নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় সরকারের ব্যবস্থাধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনেও সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে বলে বিরোধী দল অভিযোগ করেছে।

১৪ ১৯৮৬ সনের ১৫ই অক্টোবরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং ১৯৮৭ সনের ৩রা মার্চের নির্বাচন সত্যকে প্রমাণ করেছে আরো নগ্নভাবে।

১৫ ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনেও এর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

১৬ আর ১৯৯১ ও ১৯৯৬-এর নির্বাচনে ইসলামী দল ও জোটসমূহ এবং পীর-মাশায়েখরা চরমভাবে পরাজিত হওয়ায় এ সত্য তো আরো নগ্নভাবে প্রমাণিত হয়েছে।